মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম

পিনাকী ভট্টাচার্য

মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম

পিনাকী ভট্টাচার্য

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

প্রকাশকের কথা

ছেচল্লিশ বছরের বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সেরা অর্জন ঠিক তার জন্মের সময়ে। অর্জন-স্বাধীনতার আরাধ্য সুখ। রক্ত সাগর পাড়ি দিয়ে পাওয়া ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক বিজয়ের গৌরবগাঁথা স্বাধীনতা-উত্তর প্রজন্মের কাছে চেতনার বহ্নিশিখা, ইনসাফের বাংলাদেশ গড়ার প্রথম পাঠ। কী সেই চেতনা? কোন সে পাঠ? খাবার যত সুস্বাদু হোক না কেন, তাতে এক ফোঁটা বিষ যে কারো মৃত্যুর উপলক্ষ্য হয়ে উঠতে পারে। ইতিহাস যতই মজাদার হোক না কেন, তাতে সত্যের অপলাপ হলে, সেই ইতিহাস নির্মাতাদের আগামী প্রজন্মের সামনে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যেতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের সঠিক চেতনার ধারণা আর সত্যের পাঠোদ্ধার তাই সময়ের অন্যতম বড় দাবি।

অত্যন্ত পরিকল্পিত উপায়ে জাতির সামনে মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এক বয়ান হাজির করা হয়েছে। যে বয়ানে ইসলামের চিরায়ত দর্শন শুধু অনুপস্থিতই নয়; কখনো আসামি, কখনো পরাজিত। অথচ গল্পটা অন্যরকম। বলা যায় ১৮০ ডিগ্রি উল্টো। মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ে এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর যাপিত ধর্ম হিসেবে ইসলাম সব সময়ই আলোক মশাল বহন করেছে। ইসলাম তার স্বভাবসুলভ চরিত্রে সুবিচার প্রত্যাশী, মুক্তিকামী গণমানুষের চেতনার প্রদীপে আলো জ্বালিয়েছে। সে আলো ছড়িয়েছিল ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের প্রতি ইঞ্চি মাটিতে। ৭১-এ ইসলামের পরাজয় হয়েছে বয়ান দিয়ে যারা তৃপ্তির ঢেকুর তুলছেন, তারা এবার ঝেড়ে কাশি দিন। ছেচল্লিশ বছরের মিথ্যা বয়ানের মুখোশ খুলে দিয়ে ইতিহাসের সাগরে নতুন ঢেউ তুলেছেন প্রখ্যাত লেখক, সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকটিভিস্ট পিনাকী ভট্টাচার্য। ডাক্তারি পেশা ছেড়ে লেখালেখির চ্যালেঞ্জ গ্রহণের স্বার্থকতা এনে দিয়েছেন তিনি *মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম* গ্রন্থে। ইতিহাসের পাঠ এত প্রাঞ্জল উপস্থাপনার কৃতিত্ব নিশ্চয় উনার লেখক সত্তার বড় অর্জন। তথ্য-উপাত্ত এবং প্রামাণ্য দলিলের মাধ্যমে তিনি মুক্তিযুদ্ধের হারিয়ে দেওয়া বয়ানকে সামনে এনে দাঁড় করিয়েছেন; অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেছেন। এ যেন ইতিহাসের এক নয়া পাঠ!

অসামান্য আবেদনের এই ঐতিহাসিক বইটি প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে *গার্ডিয়ান পাবলিকেশন* গর্বিত ও উচ্ছ্বসিত। আমরা সম্মানিত লেখকের প্রতি বিনয়ের সঙ্গে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশিষ্ট লেখক ও মানবাধিকার কর্মী মুসতাইন জহির ভূমিকা এবং বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও বুদ্ধিজীবী গৌতম দাস পরিশিষ্ট লিখে বইটির পূর্ণতা এনে দিয়েছেন। আমরা দুজনের কাছেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আশা করছি, এই বইটি মুক্তিযুদ্ধের সঠিক বয়ান জাতির সামনে উপস্থাপন করে ইসলাম ও মুক্তিযুদ্ধের কৃত্রিম বিভেদের দেয়াল ভেঙে-উপড়ে ফেলবে। সত্য এভাবেই আপন মহিমায় উদ্ভাসিত হয়।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
অক্টোবর- ২০১৭

লেখকের কথা

'বয়ান' শব্দ এখানে চিন্তার কন্সট্রাকশন বা চিন্তা-কাঠামো অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। একেক চিন্তার ফ্রেম বা কাঠামোর কারণে মানুষের একেক ধরনের বয়ান হতে পারে। এই অর্থে মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলামের ভূমিকা কেমন ছিল, তা খুঁজে দেখার সিরিয়াস কাজ হয়নি। বাংলাদেশের সেক্যুলারপন্থিরা একদিকে স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতার চেতনার কথা বলে ইসলামের বিরোধিতা করে, অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলেও ইসলামের বিরোধিতা করে। আসলে তারা মূলত ইসলাম বিদ্বেষের (Islamophobia) জায়গা থেকে এটা করে থাকে। তারা ইসলাম আর মুক্তিযুদ্ধকে এমন পরস্পর বিরোধিভাবে দাঁড় করায়; যেন একটা থাকলে আর একটা থাকবে না। তাদের সেই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে তারা মুক্তিযুদ্ধে ইসলাম ও এর অবদান, ব্যবহৃত পরিভাষা এবং নাম-চিহ্নগুলো সব সময় আড়াল করার চেষ্টা করেছে। ইতিহাসের ধুলো-কালি সরিয়ে সেই আত্মানুসন্ধানে ব্রতী হওয়া আজকের সময়ের দাবি।

একাত্তরের ১০ এপ্রিল (পরে আনুষ্ঠানিকভাবে ১৭ এপ্রিল) স্বাধীনতার ঘোষণা (Proclamation) করা হয়েছিল। সেখানে রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে তিনটি মূলনীতির কথা বলা হয়েছিল- সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার। অর্থাৎ বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষিত ও লিখিত উদ্দেশ্য ছিল নাগরিক মানুষের এক সাম্য প্রতিষ্ঠা, মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং ন্যায়বিচার বা ইনসাফ কায়েম ও চর্চার উপযোগী গণমানুষের রাষ্ট্র গড়ে তোলা। এটা সেই অর্থে মডার্ন ক্লাসিক্যাল রিপাবলিক ধারণার বাইরের কিছু নয়। রুশো সামাজিক চুক্তিতে যেমন বলেছিলেন, 'আমাদের এমন একটা সংস্থা তৈরি করতে হবে, যার মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রত্যেকের অস্তিত্ব এবং সম্পদকে রক্ষার জন্য সমগ্র সংস্থার শক্তিকে এমনভাবে বিন্যস্ত করতে পারি, যাতে আমরা যখন সমগ্রের সঙ্গে মিলিত হই, তখন আমরা নিজেদের সম্মতিতে নিজেদের ইচ্ছারই মাত্র অনুগত হই এবং স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আমাদের স্বাধীনতা এবং শক্তি পূর্বের মতোই অক্ষত থাকে। তার কোনো ক্ষতি ঘটে না।'

এভাবেই সামাজিক চুক্তি বিকশিত হয়। এ চুক্তি কোনো নিরঙ্কুশ শাসক তৈরি করে না। প্রত্যেক ব্যক্তি তার সমস্ত অধিকারকে সামাজিক চুক্তির দ্বারা সমষ্টির নিকট সমুদয়ভাবে

সমর্পণ করে। মানুষ বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্তির জন্য চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। আবার সকল নাগরিক মিলে একটা সার্বভৌম সত্তা হিসেবে রাষ্ট্রের অধীনে নিজেরা কনস্টিটিউট অর্থে গঠিত হয়। প্রত্যেকে নিজেদেরকে সমর্পণ করবে একটা পলিটিক্যাল কমিউনিটির কাছে; অথচ ব্যক্তিগতভাবে কারো কাছে নত হবে না। ক্ষমতা এখানে ব্যক্তিবিশেষের নয়; পরস্পরের সঙ্গে মিলে তৈরি এক রাজনৈতিক কমিউনিটির। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণায় গৃহীত রাষ্ট্রগঠনের তিন নীতি বিশ্লেষণ করলে সামাজিক চুক্তির এই বক্তব্যই অনুমোদিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধে ইসলামের ভূমিকা কী ছিল, কীভাবে ইসলামের বয়ান মুক্তিযুদ্ধকে শক্তিশালী করেছে, অবদান রেখে সাহায্য করেছে, তা কখনো বিশ্লেষণ করে দেখা হয়নি। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে এই ভূমিকার একটা নিরপেক্ষ পর্যালোচনা প্রয়োজন। এই পর্যালোচনার ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক সর্বজনগ্রাহ্য দলিলসমূহ থেকেই এখানে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে কীভাবে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকরা এবং মাঠের বীর মুক্তিযোদ্ধারা ইসলাম থেকে তাঁদের লড়াইয়ের বৈধতা খুঁজে নিচ্ছেন এবং নিজেকে উদ্দীপ্ত করছেন।

এই বইয়ে বিভিন্ন দলিলের বরাতে ইসলামের ভূমিকা কী ছিল তার তথ্য-প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে। বইয়ের পাণ্ডুলিপি পাঠ করে রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও কলামিস্ট গৌতম দাস পরিপূর্ণ একটা বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন, ইসলাম প্রসঙ্গে তথ্য-প্রমাণগুলো কেন ইসলামের বাইরের নয়, কেন ইসলামি মূল্যবোধেরই বহিঃপ্রকাশ এবং এর সামাজিক পটভূমি কী ছিল। লেখাটি পরিশিষ্ট হিসেবে বইয়ের শেষে সংযোজন করা হলো। আর খুব অল্প সময়ে মুসতাইন জহির একটি ভূমিকা লিখেছেন। তাঁদের দুজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

পরিশেষে বলতে হবে এই বিশ্লেষণ অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ নয়, তবে এ থেকেই আগ্রহী পাঠক যদি মুক্তিযুদ্ধে ইসলামের ভূমিকা উপলব্ধি করতে পারেন এবং এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধিৎসু হন, সেটাই হবে এই বইয়ের সার্থকতা।

পিনাকী ভট্টাচার্য
ঢাকা, অক্টোবর- ২০১৭

ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম বইটির শিরোনাম থেকেই প্রসঙ্গটা পড়া যাক। লেখক পিনাকী ভট্টাচার্য মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক বয়ানে ইসলাম প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলছেন; শিরোনামে ব্যবহৃত তিনটি শব্দ থেকে এতটুকু খুব সহজেই আন্দাজ করে নেওয়া যাচ্ছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নও জাগছে, সেটা কোন বয়ান? কার বয়ান? আমরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বলে প্রচলিত যে সমস্ত ব্যাখ্যা বা বয়ানের সঙ্গে পরিচিত, তাই কি? এখানে প্রশ্নটি আমাদের ভাবনায় একটা যতি চিহ্ন টেনে দেয়। আমাদের থামতে হয়, কারণ এটাও আন্দাজ করে নেওয়া যাচ্ছে যে, 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' নামক আমাদের 'চেনা-জানা' বয়ানের পুনরাবৃত্তি এই বইয়ের উদ্দেশ্য হওয়ার কথা নয়। ইসলামকে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে যেভাবে বিরোধাত্মক বা বিপ্রতীপ সম্পর্কের ছাঁচে ঝালাই করে আস্ত একটা জাদুঘর প্রকল্প খাড়া করা হয়েছে, এই বইটি তাকে আরেক প্রস্থ দীর্ঘতর করার কোনো প্রয়াস নয়। বরং এটা খোদ সেই পাটাতন খুলে দেখানোর চেষ্টা, যার ওপর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে ধর্মরিপেক্ষতার আড়ালে ইসলাম বিরোধী একটি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বয়ান প্রতিনিয়ত পুনরুৎপাদন করা হয়।

এই যে যতি ও বিরতি, থেমে নতুন করে দেখা এবং সেখান থেকে প্রস্থান-রেখা ও সূচনা-বিন্দু নির্ণয় করা, জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিমণ্ডলে এর একটা নাম আছে। পদ্ধতিগত দিক বিবেচনায় যাকে ছেদটানা (Epistemological break) বলে আখ্যায়িত করা হয়। আমি নিশ্চিত, *মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম* বইটি বাংলাদেশে এই ঘটনা ঘটাবে। সেটা কেন দাবি করা যায়, সেই প্রসঙ্গে কয়েকটা নোক্তা দেওয়াই এই ভূমিকার উদ্দেশ্য।

তাহলে শিরোনাম থেকে যে প্রশ্নটা জেগেছে, তার উত্তর পেতে নিশ্চিতভাবেই প্রচলিত ব্যাখ্যার বাইরে গিয়ে একটা নতুন বয়ান অনুসন্ধানে নামতে হবে। যদি তাই হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের সামনে দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট, প্রেরণা, আকাঙ্ক্ষার ভাষা, যুদ্ধের ন্যায্যতা নির্মাণ ও পরিচালনায় উপাদান ও আশ্রয় হিসেবে ইসলাম কোথায়, কতটুকু উপস্থিত ছিল? তার ব্যাপ্তি ও গভীরতা কতটুকু? শুধু ব্যাপকতার নিরিখেই নয়, পাশাপশি ইসলাম এই বয়ান সংগঠনে কতটা নির্ধারক ভূমিকা রেখেছে, তা স্বাধীনতা-সংগ্রামের সূচনা থেকে যুদ্ধকালীন দলিল, রাজনৈতিক প্রচার-পুস্তিকা ও ঐতিহাসিক তথ্য-

উপাত্ত দিয়ে সুসংহতভাবে দেখানো সম্ভব কি না? আমার মতে, এই বইয়ে লেখক তা বেশ জোরালোভাবেই দেখাতে পেরেছেন বলা যায়। আর তা এমন একটা বিরাট ক্ষেত্র উন্মোচন, যা দেশের জাতীয়তাবাদী সেক্যুলার বয়ানের অসারতার বাইরে এসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে পুনরায় পাঠ করার নতুন প্যারাডাইম তৈরি করতে সক্ষম।

বলাবাহুল্য, সেক্যুলার জাতীয়তাবাদী ধারার যে রাজনীতি এখন বহাল আছে, যে বয়ানকে ঘিরে মুক্তিযুদ্ধের ন্যায্যতা দাবি করা হয়, তা খুব দ্রুতই ভেঙে পড়তে বাধ্য। আগেই বলেছি, বইটি একটা ঘটনার জন্ম দিবে। রাজনৈতিক তাৎপর্যের দিক থেকে এটা হবে যুগান্তকারী ঘটনা। এতদিন আমরা মুক্তিযুদ্ধের সেক্যুলার জাতীয়তাবাদী বয়ানের অন্যতম প্রস্তাবনা হিসেবে দেখেছি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের বিরোধিতায়, যেহেতু পাকিস্তানের সামরিক শাসক ও কতিপয় রাজনৈতিক দল ইসলামকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে, ধর্মের কথা বলে নির্যাতন ও গণহত্যা চালিয়েছে, সেহেতু মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ধর্ম তথা ইসলামের সংস্রব-মুক্ত একটা রিপাবলিক (রাজনৈতিক পরিসর) এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার লক্ষ্যই হচ্ছে যেন মুক্তিযুদ্ধের ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা! এতদিন আমরা এর মতাদর্শগত রাজনৈতিক সমস্যার দিকগুলো প্রকাশ্য হতে দেখেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও একে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গণআকাঙ্ক্ষা ও সে সময়কার চেতনা থেকে জাত একটি মূলনীতি হিসেবে গ্রহণের আবশ্যিকতা উত্থাপন করা হয়। জাতীয়তাবাদী এই ধর্মনিরপেক্ষতার চরিত্র বিশ্লেষণ বা রাজনৈতিক প্রস্তাবনার বিরোধিতা মাত্রই যেন তা মুক্তিযুদ্ধের মর্ম ও অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধাচারণ!

অথচ আমরা দেখছি, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এই তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ১৯৭২ সালে সংবিধানে প্রবেশ করার আগে রাজনৈতিক দাবি বা প্রস্তাব আকারে আলোচিত হয়েছে, এমন কোনো নজির কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে স্বভাবতই আমাদেরকে উত্তর পেতে হয়, মুক্তিযুদ্ধের যে আকাঙ্ক্ষা ও যুদ্ধ চলাকালীন সেই আকাঙ্ক্ষার পক্ষে ন্যায্যতা তৈরি করতে হয়েছে, তাতে ইসলাম প্রসঙ্গ কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে? মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলামের অনুপস্থিতি, একে সচেতনভাবে দূরে রাখা, কিংবা সরাসরি বিযুক্ত করে জনগণের মধ্যে অন্তত একটা সম্মতি সৃষ্টির প্রয়াস হতে পারে- এর সপক্ষে একমাত্র গ্রাহ্য প্রমাণ। এই গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসার সুরাহা করতে হলে, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পাঠ ও ব্যাখ্যার পদ্ধতিগত প্রশ্নটি আগে ফয়সালা করতে হয়।

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে যেসব লেখাপত্র আছে, তা বোধগম্য কারণেই বাংলাদেশের ইতিহাসের দুটি গুরুত্ব উপাদানকে কখনোই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করে না। সেই দুটি উপাদান হলো–

এক. পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন নিজেদের দাবি-দাওয়া জনগোষ্ঠীর কাছে যে ভাষায় হাজির করে, তাকে মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিন্দুতে উপনীত করেছে, সেই সমস্ত ভাষ্য, কর্মসূচি, প্রচার-পুস্তিকা।

দুই. মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যে বয়ান ও ভাষ্যকে আশ্রয় করে যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে।

পিনাকী ভট্টাচার্য এই দুটি উপাদানকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে তার অনুসন্ধানের প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। শুধু সে সময়কার বয়ান নয়, ইতিহাস ব্যাখ্যার জন্য উপাদান নির্বাচন ও গৃহীত উপাদানকে যে সম্পর্ক-সূত্র দ্বারা প্রণালিবদ্ধ করতে হয়, সেদিক থেকেও পিনাকী ভট্টাচার্য নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম পরিচালনায় নেতৃত্বদানকারী দল হিসেবে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক দাবি ও কর্মসূচি, সেই সময়কালে দেওয়া বিভিন্ন বক্তব্য, বিশেষত অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ ইত্যাদি সূত্রের আন্তঃসম্পর্ক ও প্রস্তাবিত রাজনীতিতে চরিত্রগতভাবে ইসলামের অবস্থান কী ছিল, তা ব্যাখ্যা করেছেন। একইসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়ের বিভিন্ন দলিলপত্রকে তাঁর বিশ্লেষণের জন্য উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। যা একইসঙ্গে রাজনৈতিক অবস্থান, মুক্তিযুদ্ধের সূচনার পর নতুন রাষ্ট্রের রূপকল্প ও যুদ্ধ পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত প্রেরণা হিসেবে যে ভাষার ব্যবহার করা হয়েছে তার সমাহার। পদ্ধতি হিসেবে যে কারো জন্যই এটাই প্রাথমিক এবং স্বাভাবিক হওয়ার কথা। সেটাই বাংলাদেশে দুর্ভাগ্যজনকভাবে এতদিন হয়নি। এজন্যই আমার দ্বিতীয় দাবি, এটা শুধু মুক্তিযুদ্ধের বয়ানের নতুন নির্মাণ নয়, একইসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণার ভাষা পাঠ করার একটি নতুন ধারার সূচনা।

কিন্তু এই প্রশ্নও নিশ্চয় অনেক পাঠকের থাকবে, মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম এত প্রবল ও বিপুলভাবে আমাদের চেতনা ও আকাঙ্ক্ষার ভূগোল অধিকার করে থাকবার পেছনে কী কারণ থাকতে পারে? তাহলে পাকিস্তান থেকে আমরা রাষ্ট্র হিসেবে কী কারণে আলাদা হলাম? যে রাজনৈতিক পরিচয়কে ভিত্তি ধরে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে,

জনগোষ্ঠী হিসেবে আমরা যার অংশ ছিলাম, সেখান থেকে নিজেদের আলাদা করে নেওয়ার ও দেখার সঙ্গে ইসলাম প্রশ্নের মোকাবিলা কীভাবে হয়েছে ?

এই দিকটার একটা যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা ছাড়া মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম এবং বয়ানের গ্রহণযোগ্যতা তৈরির ভারকেন্দ্র কেন ইসলামকে আশ্রয় করেই আবর্তিত হয়েছে, সেই দিকটার ফয়সালা হবে না। সেই ব্যাখ্যাটি এখানে পাঠক গৌতম দাসের ব্যাখ্যামূলক পরিশিষ্টে সংযুক্ত রচনায় বিস্তারিতভাবে পাবেন। আমরা দেখব, খোদ মুক্তিযুদ্ধ কীভাবে মূলগতভাবে ইসলামের আদর্শিক পাটাতনে দাঁড়িয়ে, পাকিস্তানি শাসকের বয়ান ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে পাল্টা ইসলামের বয়ান খাড়া করেছে। সেটা শুধু কৌশলগতভাবে পাকিস্তানি শাসকদের চালানো প্রচারণার জবাব দেওয়ার জন্য নয়। বরং এটা ছাড়া অন্য কিছু হওয়া ছিল অসম্ভব। আমাদের রাজনৈতিক পরিচয় গঠনের ঐতিহাসিক বাস্তবতার মধ্যে যার কারণ নিহিত।

রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় তো বটেই, বাংলাদেশের রাজনীতির নাড়ির যোগটা যারা ধরতে চাইবেন, আগামী দিনের বাংলাদেশকে পুনর্নির্মাণ বা নতুন রাজনীতির পরিগঠন করতে যারা ইচ্ছুক, তাদের সকলের জন্য কেন ইসলাম কেন্দ্রীয় বিবেচ্য হিসেবে থেকে যেতে বাধ্য। *মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম* বইটি সামগ্রিকভাবে তারই স্বাক্ষর বহন করবে।

মুসতাইন জহির
ঢাকা, অক্টোবর- ২০১৭

সূচিপত্র

আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারণী রাজনৈতিক দলিলে ইসলাম	১৫
মুক্তিযুদ্ধ নির্মাণের বয়ান-বক্তৃতায় ইসলাম	২৩
ইসলামি চিহ্ন ও পরিভাষা : স্বাধীনতার ঘোষণায় ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র	২৫
মুক্তিযুদ্ধকালে সরকারি ঘোষণা ও নির্দেশনাবলিতে ইসলাম	২৯
মুক্তিযুদ্ধ বিরোধিতাকারীদের বুঝাতে ইসলামের প্রতীক ও চিহ্নের বিকৃত উপস্থাপন	৩৩
রাজাকার ছিল কারা	৪০
মুক্তিযুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষতার উৎস খোঁজে : স্বাধীন বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতির চিঠি	৪৪
মুক্তিযুদ্ধে দেশের আলেম সমাজের ভূমিকা	৫২
মুক্তিযুদ্ধে উপমহাদেশের আলেম সমাজের ভূমিকা	৫৬
স্বাধীনতা পরবর্তী উপমহাদেশের আলেম সমাজের অবস্থান ও উপলব্ধি	৬৫
মওলানা ভাসানী ও মুক্তিযুদ্ধ	৬৮
রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের চিঠিপত্রে ইসলামি ভাব-প্রভাব	৭৫
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠানসমূহে ইসলাম প্রসঙ্গ	৮২
মুক্তিযুদ্ধকালীন আওয়ামী লীগের মুখপত্র *জয়বাংলা* পত্রিকায় ইসলাম প্রসঙ্গ	৯৯
উপসংহার	১১৩
পরিশিষ্ট : মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম– প্রসঙ্গ কথা গৌতম দাস	১১৬
গ্রন্থপঞ্জি	১৪১

এক

আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারণী রাজনৈতিক দলিলে ইসলাম

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দলটির নাম নিঃসন্দেহে আওয়ামী লীগ। আলোচনার শুরুতে মুক্তিযুদ্ধের আগে-পরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারণী দলিল, বক্তব্য ও কর্মসূচিতে ইসলাম ও ইসলামের অনুষঙ্গ কীভাবে ছিল, প্রথমে আমরা তার একটু সন্ধান করব। এখানে সাতটি আলাদা রেফারেন্স তুলে সেই সন্ধানে যাব।

এক.

১৯৬৯ সালে প্রস্তাবিত খসড়া সংবিধান সংশোধনী বিলে সংবিধানে 'ইসলামি রিপাবলিক অব পাকিস্তান' শিরোনামসহ এর ইসলামি আদর্শ বহাল রাখার বিষয়ে আওয়ামী লীগ সম্মতি জানিয়েছিল।[১]

দুই.

পাকিস্তান আওয়ামী লীগ তাদের কাউন্সিল অধিবেশন ৬ জুন ১৯৭০-এ যে কর্মসূচি গ্রহণ করে, সে বিষয়ে পরের দিন ৭ জুন *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকায় একটি রিপোর্ট ছাপা হয়।

সেখানে বলা হয়–

'কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তানে যাতে কোনো আইন পাস না হইতে পারে, তজ্জন্য আওয়ামী লীগ শাসনতান্ত্রিক বিধান রাখার কথাও দলীয় কর্মসূচিতে ঘোষণা করে।

---

১. মওদুদ আহমদ, অনুবাদ : জগলুল আলম, *বাংলাদেশ: শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৬, পৃষ্ঠা : ১২০, ১৬৫।

শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের পবিত্রতা রক্ষার গ্যারান্টি দেওয়া হইবে এবং সকল পর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হইবে। আইনের দৃষ্টিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম-মর্যাদার অধিকারী বিবেচিত হইবে এবং আইনের দ্বারা সমানভাবে তাদের নিরাপত্তাবিধান করা হইবে। সংখ্যালঘুদের নিজ নিজ ধর্ম আচরণ, প্রচার ও ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে। নিজ নিজ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রক্ষা করার ব্যাপারেও তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে।'[২]

তিন.

১৯৭০ সালের নভেম্বরে সাধারণ নির্বাচনের আগে বেতারে ও টেলিভিশনে বঙ্গবন্ধু একটি ভাষণ দেন। সেই ভাষণে 'লেবেলসর্বস্ব ইসলাম নয়' অংশে তিনি বলেন–

'আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হচ্ছে, আমরা ইসলামে বিশ্বাসী নই। এ কথার জবাবে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য– লেবেলসর্বস্ব ইসলামে আমরা বিশ্বাসী নই। আমরা বিশ্বাসী, ইনসাফের ইসলামে। আমাদের ইসলাম হযরত রাসুলে করীম ﷺ-এর ইসলাম; যে ইসলাম জগৎবাসীকে শিক্ষা দিয়েছে ন্যায় ও সুবিচারের অমোঘ মন্ত্র। ইসলামের প্রবক্তা সেজে পাকিস্তানের মাটিতে বরাবর যারা অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, বঞ্চনার পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছেন; আমাদের সংগ্রাম সেই মোনাফেকদের বিরুদ্ধে। যে দেশের শতকরা ৯৫ জন মুসলমান, সে দেশে ইসলামবিরোধী আইন পাসের ভাবনা ভাবতে পারেন তারাই, ইসলামকে যারা ব্যবহার করেন দুনিয়াটা শায়েস্তা করার জন্য'।[৩]

চার.

'৭০-এর নির্বাচনে বিজয়ের পরে ৩রা জানুয়ারি রমনায় একটি সমাবেশে শেখ মুজিবুর রহমান বিরোধীদের এই ক্ষতিকর প্রচারণা উড়িয়ে দেন যে তার দল মুসলমানের দল নয় এবং আওয়ামী লীগে মুসলমান ঐতিহ্যের চাইতে হিন্দু ঐতিহ্যেকেই ধারণ করে। সমাবেশ কোরআন তেলাওয়াত দিয়ে শুরু হয় এবং বক্তৃতায় শেখ মুজিবুর রহমান আল্লাহ্‌র ধর্মকে

---

২. নুহ-উল-আলম লেনিন সম্পাদিত, *বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও নির্বাচিত দলিল*, সময় প্রকাশন, ২০১৫, পৃষ্ঠা : ২৫৫-৫৬।

৩. *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ*, নভেল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা : ২১।

রাজনৈতিক কার্ড হিসেবে ব্যবহারের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেন। তিনি উচ্চস্বরে 'আসসালামু আলাইকুম' বলে তার বক্তব্য শুরু করেন এবং একটা প্রশ্ন ছুড়ে দেন– 'ন্যাশনাল এবং প্রাদেশিক এসেম্বলিতে আওয়ামী লীগ নেতারা নির্বাচিত হওয়ার পরেও কোথাও কি ইসলামের চর্চা ও ব্যবস্থা সম্পর্কে আওয়ামী লীগকে জড়িয়ে কোনো অভিযোগ এসেছে? মানুষ কি তার নিজস্ব বিশ্বাস নিয়ে চলছে না? ইসলামের কি কোনো ক্ষতি হয়েছে? ইসলাম কি চলে গেছে, এই মহান ধর্মে কি আর কেউ এখন দীক্ষিত হচ্ছে না? শেখ মুজিব বলেন, আমি জানি আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে এই ঘৃণ্য প্রচার চালাতে পূর্ব পাকিস্তানে কত টাকা ঢালা হয়েছে।' সমাবেশে আন্দোলনে নিহতদের মাগফেরাত কামনার জন্য ফাতেহা পাঠ করা হয়। এর মধ্যেই আসরের আযান শুরু হলে শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই সভার কাজ মুলতবি রাখার পরামর্শ দেন। তিনি আরো বলেন, আওয়ামী লীগ নয়; বরং যারা তাঁদের ঘৃণ্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ইসলামকে ব্যবহার করছে তারাই ইসলামের ক্ষতি করছে। সভা শেষে শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই 'নারায়ে তাকবির' স্লোগান তোলেন।[৪]

পাঁচ.

৭০-এর নির্বাচন মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগ মুহূর্তের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনা। এর আগে নির্বাচনী ইশতেহারে আওয়ামী লীগ স্পষ্টভাবেই ইসলাম প্রশ্নে তাদের অবস্থান ঘোষণা করেছিল এভাবে–

> '৬-দফা বা আমাদের অর্থনৈতিক কর্মসূচি ইসলামকে বিপন্ন করে তুলেছে বলে যে মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে, সেই মিথ্যা প্রচারণা থেকে বিরত থাকার জন্য আমি শেষবারের মতো আহ্বান জানাচ্ছি। অঞ্চলে অঞ্চলে এবং মানুষে মানুষে সুবিচারের নিশ্চয়তা প্রত্যাশী কোনো কিছুই ইসলামের পরিপন্থি হতে পারে না। আমরা এই শাসনতান্ত্রিক নীতির প্রতি অবিচল ওয়াদাবদ্ধ যে, কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশিত ইসলামি নীতির পরিপন্থি কোনো আইনই এ দেশে পাস হতে বা চাপিয়ে দেওয়া যেতে পারে না'।[৫]

---

৪. দ্য পাকিস্তান টাইমস, লাহোর, জানুয়ারি ৪, ১৯৭১

৫. নুহ-উল-আলম লেনিন সম্পাদিত, *বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও নির্বাচিত দলিল*, সময় প্রকাশন, ২০১৫, পৃষ্ঠা : ২৬৫।

ছয়.

পাকিস্তানি শাসকেরা ২৫ মার্চের পরে গণহত্যা চালিয়েছে। আর তাদের সেই ঘৃণ্য কাজের পক্ষে সাফাই হিসেবে কখনো তা পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য, আবার কখনো তা ইসলামকে রক্ষার জন্য করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ সব সময়ই ইসলাম এবং মুসলমানের কল্যাণের নামে করা এই কাজকে রাজনৈতিক ধোঁকাবাজি হিসেবে দেখেছে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতারা তাঁদের বক্তব্যে বারবার প্রসঙ্গটি এনে জনগণকে সতর্ক করেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও সে কথা উল্লেখ করেছেন ঠিক এভাবে–

> 'জনগণকে ইসলাম ও মুসলমানের নামে স্লোগান দিয়ে ধোঁকা দেওয়া যায় না। ধর্মপ্রাণ বাঙালি মুসলমানরা তাদের ধর্ম ভালোবাসে; কিন্তু ধর্মের নামে ধোঁকা দিয়ে রাজনৈতিক কার্যসিদ্ধ করতে তারা দেবে না'।[৬]

সাত.

যে আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছে, সেই আওয়ামী লীগের গড়ে ওঠার সকল পর্যায়ে ইসলাম সব সময়েই তার বয়ানে প্রধান উপাদান হিসেবে ছিল। যেমন :

ক. আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা হয় যে সম্মেলনে, সেই সম্মেলনে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক 'মূল দাবি' শীর্ষক একটি পুস্তিকা পাঠ করেন। এই পুস্তিকায় সুস্পষ্ট করে বলা হয়–

> 'রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব আল্লাহর প্রতিভূ হিসেবে জনগণের ওপর ন্যস্ত থাকবে। গঠনতন্ত্র হবে নীতিতে ইসলামি, গণতান্ত্রিক ও আকারে রিপাবলিকান।'[৭]

তাদের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রের ১ নং ধারায় 'দুনিয়ার মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন শক্তিশালী করার' কথা বলা হয়। গঠনতন্ত্রের ১০ নং ধারায় বলা হয়–

---

৬. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১২, পৃষ্ঠা : ২৫৮।

৭. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, প্রথম খণ্ড, আনন্দধারা প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৭০, পৃষ্ঠা : ২৬২।

'To disseminate true knowledge of Islam and its high morals and religious principles among the people.

অর্থাৎ জনগণের মধ্যে ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান, তার উচ্চ-নৈতিক শিক্ষা ও ধর্মীয় নীতিমালার বিস্তার করা।'[৮]

খ. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট (যার প্রধান শরিক দল ছিল আওয়ামী লীগ এবং অন্যতম শরিক দল ছিল নেজামে ইসলাম পার্টি) মুসলিম লীগকে পরাজিত করে। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচির মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয় :

'কুরআন-সুন্নাহর মৌলিক নীতির খেলাফ কোনো আইন প্রণয়ন করা হবে না এবং ইসলামি সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকদের জীবনধারণের ব্যবস্থা করা হবে।'[৯]

গ. ১৯৫৫ সালের মে মাসে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর পক্ষ থেকে যে সাংগঠনিক প্রচারপত্র বের হয়, তার ১৭ ও ১৮ নং দাবি ছিল এরকম :

'(১৭) মদ, গাঁজা, ভাং, বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদি হারাম কাজ আইন করিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করিতে হইবে।

(১৮) মুসলমানগণ যাহাতে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি শরীয়তসম্মত কাজে অবহেলা না করেন এবং সকল শ্রেণির নাগরিকগণের চরিত্র গঠনের জন্য প্রচার (তাবলীগ) বিভাগ খুলিতে হইবে। হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।[১০]

ঘ. ১৯৬৬ সালে তদানীন্তন আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা পেশ করেন। পরবর্তীকালে এই ৬ দফাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলন হিসেবে

---

৮. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, ১ম খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, হাক্কানী পাবলিশার্স, ২০১০, পৃষ্ঠা : ১২১।

৯. *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা : ৩৭০।

১০. *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা : ৪১৮-৪২০।

পরিণতি লাভ করে। সেই ৬ দফা ছিল মূলত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবি। এতে কোনো 'ধর্মনিরপেক্ষতার' কথা ছিল না। বরং প্রথম দফা ছিল লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি।

ঙ. ১৯৬৯ সালের আইয়ুব বিরোধী ছাত্র-গণআন্দোলনে ছাত্রসমাজের ১১ দফা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উক্ত ১১ দফায় গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকলেও 'ধর্মনিরপেক্ষতার' কথা কোথাও দাবি করা হয় নাই।

চ. ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে পরিষ্কার ঘোষণা দেওয়া হয় যে, 'কুরআন সুন্নাহ্ বিরোধী কোনো আইন পাস করা হবে না'। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করার পর তাদের সংবিধান কমিটি (ড. কামাল হোসেন যার চেয়ারম্যান ছিলেন) কর্তৃক প্রণীত খসড়া সংবিধানের প্রস্তাবনায় তদানীন্তন পাকিস্তানের মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে কুরআন সুন্নাহর আলোকে গড়ে তোলার কথা স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছিল।[১১]

ছ. ৭০-এর নির্বাচনের পর সংবিধান কমিটি প্রণীত সেই খসড়া সংবিধানে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি)Directive principles of state policy(হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সন্নিবেশিত হয়েছিল :

(১) কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন পাস করা হবে না।
(২) কুরআন ও ইসলামিয়াত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।
(৩) মুসলমানদের মধ্যে ইসলামি নৈতিকতা উন্নয়নের পদক্ষেপ নেওয়া হবে।[১২]

জ. সম্প্রতি প্রকাশিত শেখ মুজিবুর রহমানের রচনাসংগ্রহেও ১৯৭০-এর নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্রে শাসনতন্ত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য বিষয়ে তাঁর মতামত পাওয়া যাচ্ছে–

---

১১. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, ২য় খণ্ড, সংযোজন ১, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, হাক্কানী পাবলিশার্স, ২০১০, পৃষ্ঠা : ৭৯৩ (ইংরেজি থেকে অনূদিত)।

১২. *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৭৯৪ (ইংরেজি থেকে অনূদিত)।

(১) জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের প্রিয় ধর্ম হলো ইসলাম। আওয়ামী লীগ এই মর্মে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, শাসনতন্ত্রে সুস্পষ্ট গ্যারান্টি থাকবে যে পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহতে সন্নিবেশিত ইসলামের নির্দেশনাবলির পরিপন্থি কোনো আইন পাকিস্তানে প্রণয়ন বা বলবৎ করা চলবে না। শাসনতন্ত্রে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের পবিত্রতা রক্ষার গ্যারান্টি সন্নিবেশিত হবে। সর্বস্তরে ধর্মীয় শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য পর্যাপ্ত বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(২) সংখ্যালঘুরা আইনের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ সমান অধিকার ভোগ করবে। নিজেদের ধর্ম পালন ও প্রচার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনায় এবং নিজ নিজ ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় শিক্ষা দানের ব্যাপারে সংখ্যালঘুদের অধিকার শাসনতান্ত্রিকভাবে রক্ষা করা হবে।

স্বীয় ধর্ম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম প্রচারের জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনো ব্যক্তিকে কর দিতে বাধ্য করা হবে না। নিজ ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হলে কোনো ব্যক্তিকে ধর্ম সম্পর্কীয় কোনো নির্দেশ গ্রহণ অথবা কোনো ধর্মীয় উপাসনা বা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে জোর করা হবে না।[১৩]

তাহলে স্পষ্ট যে, ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগের জন্ম থেকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জনগণের সামনে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের কোনো প্রস্তাব বা কর্মসূচি কখনো কোথাও আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে পেশ করা হয়নি; বরং বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন ভাষায় জনগণকে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কুশাসন ও আঞ্চলিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন কখনোই ইসলাম-বিরোধী আন্দোলন নয়। বরং তারা ক্ষমতায় গেলে, কুরআন-সুন্নাহ্ বিরোধী কোনো আইন পাস করবে না। তারা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জনগণের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকেও গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট করেই বলা যায় যে, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টকে এবং ১৯৭০ সালে আওয়ামী

১৩. শেখ মুজিবুর রহমান, *মুজিবুরের রচনা সংগ্রহ*, বাংলাদেশ কালচারাল ফোরাম, ঢাকা, ২০১০, পৃ : ১৬২।

লীগকে জনগণ ভোট দিয়েছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির আশায়, আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের প্রত্যাশায়। কোনো বিবেচনায়ই জনগণ ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়নি। ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে ভোট চাওয়াও হয়নি; বরং ইসলাম সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে ভূমিকা রাখবে এমন কথাই বলা হয়েছিল।

কাজেই আমরা স্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিতে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের যথাযথ বাস্তবায়নের প্রয়াস, যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা অথবা আওয়ামী লীগের ৬ দফায় আর যা কিছুই থাকুক, সেসব কিছুর বয়ানে ইসলাম এক মুখ্য ও জরুরি ভিত্তি হিসেবে থেকেছে। যত জায়গায় আওয়ামী লীগের কাম্য রাষ্ট্রের কল্পনা করে কোনো কথা লেখা হয়েছে, তার কোথাও রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য 'ধর্মনিরপেক্ষ' হবে, এমনটা পাওয়া যায় না। এমনকি এই শব্দের অর্থ দিয়ে কিছু বর্ণনা করা হয়েছে, এমনটাও পাওয়া যায় না।

দুই

মুক্তিযুদ্ধ নির্মাণের বয়ান-বক্তৃতায় ইসলাম

৭ মার্চে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা দিয়েছিলেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো **ইনশাআল্লাহ্**।'

আবার ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি যে বেতার ভাষণ দিয়ে বিজয় ঘোষণা করেন, সেখানে তিনি তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন এই বলে—

> 'আমি মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ সব দেশবাসীকে **আল্লাহর প্রতি শোকরিয়া** জ্ঞাপনের জন্য ও একটি সুখী সমৃদ্ধশালী সমাজ গঠনে **আল্লাহর সাহায্য ও নির্দেশ কামনা** করার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি'।[১৪]

'ইনশাআল্লাহ্' বলে যে মুক্তিযুদ্ধের শুরু এবং **'আল্লাহর সাহায্য কামনা করে'** আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ, সেই মুক্তিযুদ্ধকে পরবর্তী সময়ে প্রকারান্তরে ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যেহেতু পাকিস্তানের অখণ্ডতা আর ইসলামকে সমার্থক করে তুলেছিল এবং নির্মম গণহত্যাকে ইসলামের নামে জায়েয করতে চেয়েছিল, সে কারণেই ইসলাম-বিদ্বেষীরা মুক্তিযুদ্ধ আর ইসলামকে মুখোমুখি দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছে। ১৯৭১-এ ইসলামপন্থি মুখ্য দল ছিল তিনটি- জামায়াতে ইসলামী, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম এবং নেজামে ইসলাম। এর মধ্যে জামায়াতে ইসলামী এবং নেজামে ইসলাম সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে। তবে নেজামে ইসলাম দলটি সাংগঠনিকভাবে

---

১৪. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, হাক্কানী পাবলিশার্স, ২০১০, পৃষ্ঠা : ৩১৪।

দুর্বল ছিল এবং মাঠে-ময়দানে ততটা সক্রিয় ছিল না। অন্যদিকে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ছিল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে। তাই এই দলের সভাপতি পীর মোহসেন উদ্দিন দুদু মিয়া দল থেকে পদত্যাগ করে পশ্চিমাদের সহযোগী হন।[১৫]

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর প্রশ্নে বাংলাদেশের আলেমগণ সবাই একমত ছিলেন। সেই সময়ে সমগ্র আলেম সমাজের মাত্র ১০% আলেম রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন ও রাজনীতির খোঁজখবর রাখতেন ।[১৬]

কওমী ধারার তৎকালীন অরাজনৈতিক অংশটি সম্পর্কে বলতে হয়, তারা সক্রিয় রাজনীতিতে না থাকলেও রাজনীতি সম্পর্কে একেবারে উদাসীনও ছিলেন না। ভারতে অবস্থিত দারুল উলুম দেওবন্দের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্কের কারণে তারা ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টিতে ব্যথিত ছিলেন, যদিও পাকিস্তান-বিরোধী ছিলেন না। তাই মুক্তিযুদ্ধকালে এদের নিষ্ক্রিয় নৈতিক সহানুভূতির পাল্লা কিছুটা হলেও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সক্রিয় রাজনৈতিক সমর্থন ছিল। বেগম জিয়ার পূর্ববর্তী শাসনামলের শেষ দিকে শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হকের ওপর হামলা হলে তৎকালীন ছাত্রলীগ সভাপতি এর নিন্দায় প্রদত্ত বিবৃতিতে তাঁকে 'মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের আলেম' বলে অভিহিত করেছিলেন।[১৭]

---

১৫. শাকের হোসাইন শিবলি, *একাত্তরের চেপে রাখা ইতিহাস: আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে*, আল-এছহাক প্রকাশনী, ২০১৪, ভূমিকা 'সাহসের সমাচার'।

১৬. তারেক মুহম্মদ তওফীকুর রহমান, *বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলিম সমাজের ভূমিকা ও প্রভাব (১৯৭২-২০০১)*, একাডেমিক প্রেস অ্যান্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরি, ২০০৭, পৃষ্ঠা : ২৪।

১৭. *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা : ৫৫।

তিন

ইসলামি চিহ্ন ও পরিভাষা : স্বাধীনতার ঘোষণায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ঐতিহাসিক দলিলগুলো যদি আমরা পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখতে পাব মুক্তিযুদ্ধের ন্যায্যতা (Source of all justification) আমরা খুঁজেছি ধর্মের মধ্যে; বিশেষত ইসলামের মধ্যে। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধাদের ন্যায়যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে ইসলামের রেটরিক বা বয়ান। মুক্তিযোদ্ধারাও যোগাযোগের সময়ে বা চিঠিপত্রে ব্যবহার করছে তাঁর যাপিত ইসলামি জীবনের নানা কথা।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার বা মুজিবনগর সরকার বিষয়ে প্রথম খবর জানা যায় ১৯৭১-এর ১০ এপ্রিল। পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে এই সরকারের মন্ত্রিপরিষদ সদস্যরা শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে দেশের জনগণের প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হলেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য মুক্তিবাহিনী সংগঠন ও সমন্বয়, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন আদায় এবং এই যুদ্ধে প্রত্যক্ষ সহায়তাকারী রাষ্ট্র ভারতের সরকার ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পর্ক রক্ষায় এই সরকারের ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

এই সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ প্রবল যুদ্ধে রূপ নেয় এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের বিজয় অর্জন ত্বরান্বিত হতে থাকে।

'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' একটি অস্থায়ী বেতার সম্প্রচার কেন্দ্র, যা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়ার পর এর নাম বদলে 'বাংলাদেশ বেতার' করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ২২ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশে ঢাকা থেকে সম্প্রচার শুরু করে বাংলাদেশ বেতার, যা 'রেডিও পাকিস্তান'-এর ঢাকা কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধা ও দেশবাসীর মনোবলকে উদ্দীপ্ত করতে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' অবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখেছিল। যুদ্ধের সময়ে প্রতিদিন মানুষ অধীর আগ্রহে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শোনার জন্য অপেক্ষা করত। 'জয় বাংলা, বাংলার জয়' গানটি এ বেতার কেন্দ্রের সূচনা সংগীত হিসেবে প্রচারিত হতো।[১৮]

চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শুরু বলা যেতে পারে। সে সময়ে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র আগ্রাবাদে অবস্থিত বেতার ভবন ও কালুরঘাট ট্রান্সমিটার–এ দুটির সমন্বয়ে গঠিত ছিল। আগ্রাবাদ বেতার ভবন থেকে অনুষ্ঠানগুলো টেলিফোন লাইন, এফএম ট্রান্সমিটার অথবা এক্সটিএলের মাধ্যমে কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে পাঠানো হতো। কালুরঘাট ট্রান্সমিটার তা গ্রহণ করে ৩৪৪.৮ মিটার বা ৮৭০ কিলোহার্জে প্রচার করত। কালুরঘাট সম্প্রচার কেন্দ্রে একটি ছোট স্বয়ংসম্পূর্ণ ইমার্জেন্সি স্টুডিও ছিল। চট্টগ্রাম বেতারের প্রচারক্ষমতা ছিল ১০ কিলোওয়াট, ইমার্জেন্সি স্টুডিও ব্যবহারের সময়ও ওই ১০ কিলোওয়াট ক্ষমতাই ব্যবহৃত হতো। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রচারক্ষমতাও ছিল ১০ কিলোওয়াট। কালুরঘাট সম্প্রচার কেন্দ্রটির অবস্থান চান্দগাঁও এলাকায়, বর্তমানে বহদ্দারহাট বাস টার্মিনালের উত্তর পাশে অবস্থিত।

২৬ মার্চে এই কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকেই স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হয়। এরপর ২৬ থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত এই কেন্দ্র মোট ১৩টি অধিবেশন সম্প্রচার করে বলে জানা যায়।

প্রথম অধিবেশনে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার পর ২৬ মার্চ সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি'- এ বাক্য উচ্চারণের মাধ্যমে শুরু

---

১৮. মুহাম্মদ নূরুল কাদির, *দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা*, ৩য় সংস্করণ, সিটি পাবলিশিং হাউস লি., ঢাকা, '৯৭, পৃষ্ঠা : ৭৩।

হয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দ্বিতীয় অধিবেশন। কবি আবদুস সালাম কর্তৃক **কোরআন তেলাওয়াতের** মাধ্যমে শুরু হয় মূল অধিবেশন। এরপর ডাক্তার আনোয়ার আলীর কাছ থেকে পাওয়া বঙ্গবন্ধুর নামাঙ্কিত 'জরুরি ঘোষণা' শীর্ষক স্বাধীনতার ঘোষণা-সম্পর্কিত প্রচারপত্রটি বিভিন্ন কণ্ঠে বারবার প্রচারিত হয়। বহির্বিশ্বের সাহায্য কামনায় ইংরেজিতে নিউজ বুলেটিনে কণ্ঠ দেন বেতারের প্রযোজক আবদুল্লাহ্ আল ফারুক। কবি আবদুস সালাম স্বাধীনতার পক্ষে ও পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে বাংলার সর্বস্তরের জনগণকে যার হাতে যা আছে তা নিয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন।[১৯]

কবি আবদুস সালামের এই ঘোষণাকে বলা যেতে পারে, ২৬ মার্চের পাল্টা যুদ্ধ ঘোষণার পর বেতারের প্রথম বেসামরিক ঘোষণা। কী বলেছিলেন তিনি সেই ঘোষণাতে? আসুন সেই ঘোষণা পড়তে শুরু করি।

'নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লীয়ালা রাসুলিহীল কারিম'

আসসালামু আলাইকুম,

প্রিয় বাংলার বীর জননীর বিপ্লবী সন্তানেরা। স্বাধীনতাহীন জীবনকে **ইসলাম** ধিক্কার দিয়েছে। আমরা আজ শোষক প্রভুত্বলোভীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছি। এ গৌরবোজ্জ্বল স্বাধিকার আদায়ের যুদ্ধে, স্বাধীনতার যুদ্ধে, আমাদের ভবিষ্যৎ জাতির মুক্তিযুদ্ধে মরণকে বরণ করে যে **জান-মাল কোরবানি দিচ্ছি, কোরআনে করিমের ঘোষণা- তারা মৃত নহে, অমর।**

দেশবাসী ভাইবোনেরা, আজ আমরা বাংলার স্বাধীনতার সংগ্রাম করছি।

আল্লাহর ফজল করমে বাংলার আপামর নর-নারী আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করে চলেছেন। আর সবখানে আমাদের কর্তৃত্ব চলছে। আমরা যারা সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছি– তাঁদের আপনারা সকল প্রকার সহযোগিতা দিন। এমনকি খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও সহায়তা দিন। স্মরণ রাখবেন দুশমনরা মরণকামড় দিয়েছে। তারা এ সোনার বাংলাকে সহজে

---

১৯. মোহাম্মদ মাহবুবুল হক, 'কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা', *প্রথম আলো*, ২৬শে মার্চ ২০১২।

তাদের শোষণ থেকে মুক্তি দিতে চাইছে না। কোনো অবাঙালি সৈনিকের কাজেই সাহায্য করবেন না। মরণ তো মানুষের একবার। বীর বাংলার বীর সন্তানেরা শৃগাল-কুকুরের মতো মরতে জানে না। **মরলে শহিদ, বাঁচলে গাজী।**

কোনো গুজবে কান দেবেন না। খালি হাতে কয়েকজন মিলে কোনো পশ্চিমা মিলিটারির মোকাবিলা করবেন না। ওরা আমাদের দেশে এসে আমাদের খেয়েই শক্তি জুগিয়ে আমাদের নির্বিচারে হত্যা করবে- তা হতে পারে না। দশজনে হলেও একজনকে খতম করুন। সমস্ত প্রকার অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। যারা নিরস্ত্র তারা অন্তত সোডার বোতল, বাজি প্রস্তুতকারীরা মরিচের গুঁড়ার ঠোঙা বানিয়ে ওদের প্রতি নিক্ষেপ করলে টিয়ার গ্যাসের কাজ করবে। বিজলি বাতির বাল্বে এসিড ভরে তাও নিক্ষেপ করুন। একেবারে খালি হাতে থাকবেন না। মরবেন তো মেরেই ইতিহাস সৃষ্টি করুন।[২০]

'নাছরুম মিনাল্লাহে ওয়া ফাতহুন কারিব। আল্লাহর সাহায্য ও জয় নিকটবর্তী'।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ কলকাতা বেতার স্টেশন থেকে বিশ্ববাসীর প্রতি বঙ্গবন্ধুর একটি বক্তব্য প্রচার করা হয়। তাতে আমরা দেখি সর্বশেষে বঙ্গবন্ধু বলেন :

'May **Allah bless you** and help in your struggle for freedom. JOY BANGLA.'

অর্থাৎ 'এ মুক্তিসংগ্রামে **আল্লাহ্ তোমাদের ওপর রহমত করুন এবং সাহায্য করুন।** জয় বাংলা।'[২১]

---

২০. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, পঞ্চম খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১০, পৃষ্ঠা : ১১।

২১. *প্রাগুক্ত*, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৩২।

চার

মুক্তিযুদ্ধকালে সরকারি ঘোষণা, নির্দেশনাবলি ও রণাঙ্গনের যুদ্ধে ইসলাম

'স্বাধীন বাংলার সংগ্রামী জনগণের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনাবলি' শিরোনামে ১৪ এপ্রিল যা প্রচারিত হয়, তার শুরু হয় **'আল্লাহু আকবার'** বলে, আর শেষ হয়– 'অতীতের চাইতে ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই সুখকর। বিশ্বাস রাখুন– **'আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় নিকটবর্তী'** বলে।'

সেই সরকারি ঘোষণায় স্বাধীনতার প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করে বলা হয়–

> 'বাঙালির অপরাধ তারা তাদের মা-বাবা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্তানিদের জন্য অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসার দাবি জানিয়েছে। বাঙালির অপরাধ **আল্লাহর সৃষ্ট** পৃথিবীতে, **আল্লাহর নির্দেশমতো** সম্মানের সঙ্গে শান্তিতে সুখে বাস করতে চেয়েছে। বাঙালির অপরাধ **মহান স্রষ্টার** নির্দেশমতো অন্যায়, অবিচার, শোষণ, নির্যাতনের অবসান ঘটিয়ে এক সুন্দর ও সুখী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলবার সংকল্প ঘোষণা করেছে। ... **আমাদের সহায় পরম করুণাময় সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাহায্য।** মনে রাখবেন, আপনার এ সংগ্রাম ন্যায়ের সংগ্রাম, সত্যের সংগ্রাম। পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদার দুশমন বাঙালি মুসলমান নারী-পুরুষ, বালক-বালিকা কাউকে হত্যা করতে, বাড়িঘর লুট করতে, জ্বালিয়ে দিতে এতটুকু দ্বিধা করেনি। **মসজিদের মিনারে আজান প্রদানকারী মুয়াজ্জেন, মসজিদে-গৃহে নামাযরত মুসল্লি, দরগাহ-মাজারে আশ্রয়প্রার্থী হানাদারদের গুলি থেকে বাঁচেনি।** এ সংগ্রাম আমাদের বাঁচার সংগ্রাম। **সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার ওপর বিশ্বাস রেখে ন্যায়ের সংগ্রামে অবিচল থাকুন।** 'অতীতের চাইতে ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই সুখকর'। বিশ্বাস রাখুন: **'আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় নিকটবর্তী'।**

জয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব! জয় বাংলা![২২]

এটি ছিল প্রবাসী সরকারের পক্ষ থেকে সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে প্রথম নির্দেশনামা। অর্থাৎ এটি শুরু হয়েছে **'আল্লাহু আকবার'** দিয়ে এবং শেষ হয়েছে পবিত্র কোরআনের দুটি আয়াত দিয়ে। এতে রয়েছে **'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর বিশ্বাসের'** কথা, এতে রয়েছে **'আল্লাহর নির্দেশমতো'** সম্মানের সঙ্গে সুখে-শান্তিতে, অন্যায়-অবিচার, শোষণ-নির্যাতনমুক্ত সুন্দর সমাজে বাস করার কথা। এ নির্দেশনামা বিশ্লেষণ করলে ধর্মনিরপেক্ষতা তো নয়ই; বরং ধর্মের প্রতি, আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বাসের বিষয়টিই স্বাধীনতার মূল্যবোধ ও চেতনা বলে স্বীকৃত হয়।

অর্থাৎ যা আমাদের সকলকে একত্রিত করবে, তেমন এক স্পিরিচুয়াল শক্তি খোঁজার আগ্রহ আর তাগিদই লক্ষ করা যায় সবখানে। মনে রাখা দরকার, এ নির্দেশটি কোনো সরকারি গোপন দলিল ছিল না, এটি পররাষ্ট্র দফতর থেকে প্রকাশিত কূটনৈতিক সার্কুলার বা বিজ্ঞপ্তি ছিল না, এটি ছিল দেশের জনগণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত অস্থায়ী সরকারের নির্দেশাবলি। এটি করা হয়েছে দেশের জনগণের চিন্তা, তার যাপিত জীবন, তার মনোভাব ও ধ্যান-ধারণাকে বিবেচনা করে। এতেই ফুটে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধের গণমুখী, গণগ্রাহ্য ও গণসম্পৃক্ত চেতনা। এ চেতনা নিয়েই জনগণ মুক্তিযুদ্ধে শরিক হয়েছিল। **'আল্লাহু আকবার' 'আল্লাহর সাহায্য প্রত্যাশা' ও 'কোরআনের বাণী'**- এই ছিল সেদিনকার মুক্তিযুদ্ধ শুরুর মর্মকথা, স্বাধীনতা যুদ্ধের আদর্শিক চেতনা, মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা ও ভাবাদর্শ। জনগণকে এ কথাই বলা হয়েছিল, জনগণ এ কথার ভিত্তিতেই মুক্তিযুদ্ধ করেছিল। এই ঘোষণা প্রকৃতপক্ষে ছিল যুদ্ধে আমাদের স্পিরিচুয়াল গাইড।

এক: আজ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দাবিদারেরা নানা কায়দায় মুক্তিযুদ্ধ ও ধর্মকে মুখোমুখী দাঁড় করানোর চেষ্টা করছেন। মূলত এর মাধ্যমে তারা আসলে একাত্তরের পাকিস্তানি শত্রুদের ভাবধারাই ধারণ করছেন। কারণ, এই কাজটিই পাকিস্তানি শত্রুরা তখন করেছিল। আর ফ্রন্টের অসম সাহসী কমান্ডো মেজর এম এ মঞ্জুর তখন **'খোদার ওপর বিশ্বাস রেখে** মরণপণ সংগ্রাম অক্ষুণ্ন রাখার প্রতিজ্ঞা করছিলেন।

---

২২. *প্রাগুক্ত*, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৬-১৮।

‘গেরিলা ম্যানুয়েল
বাংলার মুক্তিযুদ্ধ
(গেরিলা বাহিনীর নির্দেশাবলি)

‘এবারের সংগ্রাম : মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।’
আমরা বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী
আমাদের কাম্য : বাংলাদেশের স্বাধীনতা
আমাদের পণ : **খোদার ওপর বিশ্বাস রেখে** মরণপণ সংগ্রাম অক্ষুণ্ন রাখব, যতক্ষণ না আমাদের শেষ শত্রুটিকে দেশছাড়া করব এবং বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখব। ...[২৩]

দুই : সামরিক কোম্পানির ধর্মীয় কর্মাদির নিয়মকানুন
Religious function in Company)Coys(

এখানে গায়েবানা জানাযা, কোরআন পাঠ ও শহিদদের জন্য প্রার্থনা নির্দেশনা আছে। অস্থায়ী মসজিদ স্থাপন ও ইমাম নিয়োগের বিষয়ও বলা আছে। শেষে আসল কথাটা বলা আছে :

‘*This arrangement is required to boost up the morale of the service-men*’.

‘যুদ্ধক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের নির্দেশনা শেষ বিচারে যোদ্ধাদের মনোবল বাড়িয়েছিল।’[২৪]

তিন : ‘রণাঙ্গনের যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা সেনারা কোন রণধ্বনি উচ্চারণ করে শত্রুর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ত, সেটাও অনুসন্ধানের দাবি রাখে। যুদ্ধের রণধ্বনি যোদ্ধাদের যুদ্ধের প্রণোদনাকে প্রকাশ করে। জেড ফোর্সের অন্তর্ভুক্ত তৃতীয় বেঙ্গলের অধিনায়ক

---

২৩. মেজর এম এ মঞ্জুর গেরিলা বাহিনীর জন্য ১৯৭১ সালে এই পুস্তিকাটি রচনা করে প্রচার করেছিলেন। দেখুন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, একাদশ খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১০, পৃষ্ঠা : ৪৮৩।

২৪. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, একাদশ খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১০, পৃষ্ঠা : ৬১৯।

কর্নেল শাফায়াত জামিল তাঁর বইয়ে যুদ্ধের একটা গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছিলেন। আমরা সেই বর্ণনা পড়তে পারি।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর গোর্খা রেজিমেন্ট হচ্ছে এক লড়াকু বীর রেজিমেন্ট। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তারা অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিল। হিমালয়ের এই পাহাড়ি উপজাতির সামরিক দক্ষতা পৃথিবী বিখ্যাত। এই গোর্খা বাহিনীকে সিলেটের রাধানগর ছোটখেল এলাকায় পাক-সেনাদের পাল্টা আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে পশ্চাৎপসরণ করতে হয়। রাধানগর ছোটখেল এলাকা মুক্তিযুদ্ধের কৌশলগত প্রশ্নে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান হওয়ার কারণে ভারতীয় বাহিনীর জেনারেল গিল লুনি, দুয়ারীখেল ও গোরা প্রাণে অবস্থানরত তৃতীয় বেঙ্গলের সকল সেনা-সদস্যদের সংগঠিত করে একযোগে ছোটখেল আক্রমণ করে শাফায়াত জামিলকে দখল করার নির্দেশ দিলেন।

তৃতীয় বেঙ্গলের সেনারা প্রায় দেড় মাস ধরে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করে পরিশ্রান্ত, এমনকি তারা মাঝে মাঝেই অভুক্ত থাকছে। তবুও দেশ মাতৃকার জন্য তাঁরা এই আক্রমণে রাজি হয়। শাফায়াত জামিল স্বয়ং সেই আক্রমণে সেনাদের সঙ্গে থাকেন।

প্রায় একশ পঞ্চাশ জন যোদ্ধা এক সারিতে শত্রুর আবস্থানের দিকে এগোচ্ছে। লাইনের পরে শাফায়াত জামিল তার মাঝখানে কোম্পানি কমান্ডার লেফটেন্যান্ট নবী। শত্রুর অবস্থান মাত্র তিনশ গজ দূরে পৌঁছেই 'জয় বাংলা', 'ইয়া হায়দার', 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে চারিদিক ঝাঁপিয়ে তৃতীয় বেঙ্গলের ডেলটা কোম্পানি বেয়নেট উঁচিয়ে ফায়ার করতে করতে শত্রু অবস্থানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কয়েকটি ব্যাঙ্কারে রীতিমতো হাতাহাতি যুদ্ধ হলো। ডেলটা কোম্পানির সৈন্যরা তখন এক অজেয়, অপ্রতিরোধ্য শক্তি। কোনো বাধাই তাদেরকে আটকে রাখতে পারছে না। মাত্র বিশ মিনিটের মধ্যে ছোটখেলের শত্রু অবস্থানগুলোর পতন হলো। অজেয় গোর্খা বাহিনী যে-ই অবস্থান দখলের লড়াইয়ে মাত্র একদিন আগে পরাজিত হয়েছিল, আজ সেটা মুক্তিযোদ্ধাদের হাতের মুঠোয়। তৃতীয় বেঙ্গলের ডেলটা কোম্পানি প্রমাণ করলেন, বেঙ্গল রেজিমেন্টের যোদ্ধারা বিশ্বের অন্য যেকোনো রেজিমেন্টের তুলনায় কোনো অংশে কম নয়। অতুলনীয় তাদের সাহস, নিষ্ঠা আর দেশপ্রেম।'**

** সূত্র : একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, রক্তাক্ত মধ্য আগস্ট ও ষড়যন্ত্র নভেম্বর; কর্নেল শাফায়াত জামিল (অব.), সাহিত্য প্রকাশ, মার্চ ২০১৬, পৃষ্ঠা: ৮৪-৮৬।

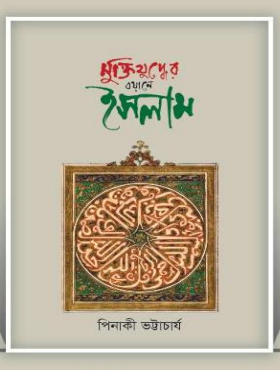

মুক্তিযুদ্ধের নির্মাণ ও মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে ইসলাম যে ডিসকোর্স হিসেবে হাজির ছিলো, তার অনুপুঙ্খ অনুসন্ধানের একটা প্রয়াস 'মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম'। ইতিহাসের হাত ধরে ঐতিহ্য নির্মিত হয়; ইতিহাসের পাঠ তাই নির্মোহ হওয়া সময়ের দাবি। চিন্তাশীল লেখক পিনাকী ভট্টাচার্য মহান মুক্তিযুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠের যাপিত ধর্ম আল-ইসলামের অবস্থান ও বয়ানকে উপস্থাপন করতে তথ্য ও প্রমাণের সাগর পাড়ি দিয়েছেন। অবগুণ্ঠন উন্মোচনের এক ইতিহাসের সফরে আপনাকে স্বাগতম।

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস
৩৪, বাংলাবাজার, ঢাকা ১০০০।
www.facebook.com/guardianpubs
www.guardianpubs.com
ISBN: 978-984-92959-7-6